কুচিয়া মাছের নিয়ন্ত্রিত প্রজনন, পোনা উৎপাদন এবং চাষ ব্যবস্থাপনা কৌশল

বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ এবং গবেষণা প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-বি, বিএফআরআই অংশ)

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
ময়মনসিংহ-২২০১

কুচিয়া মাছ বাংলাদেশে কুইচ্চা কুইচা, কুচে, কুচো ইত্যাদি নামে পরিচিত।কচিয়া ইংরেজী নামগুলো হলো Gangetic, Rice eel, Mud eel বা Swamp eel। এটি chordata Monopterus গণের আওতাভুক্ত একটি প্রজাতি। কুচিয়ার বৈজ্ঞানিক নাম Monopterus cuchia তবে কোন শ্রেণী কারকের মতে এটি Amphipnous cuchia, Unibranchap ertura cuchia নামেও অভিহিত। বাংলাদেশ, ভারতের উত্তারঞ্চল,নেপাল, মায়ানমার এবং পাকিস্তান কুচিয়ার আবাসভূমি হিসেবে পরিচিত।

কুচিয়ার ফুলকা বিলুপ্ত তবে শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য মাথার দুইপাশে থলে আকৃতির অঙ্গ রয়েছে। কুচিয়ার শরীর লম্বা বেলনাকৃতির এবং স্লাইম নি:সরিত হয় বিধায় শরীর পিচ্ছিল হয়ে থাকে ফলে বিপদের সময় সামনে এবং পিছনে চলাচল করতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে কুচিয়া মাছকে আইবিহীন মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এর গায়ে ক্ষুদ্রাকৃতির আঁইশ বিদ্যমান যার বেশীরভাগ অংশই চামড়ার নীচে সজ্জিত থাকে। এছাড়া কম গভীর জলাশয়ে এরা সহজেই বাস করতে পারে। কুচিয়া মাটিতে গর্ত করে বা জলজ আবর্জনা নীচে থাকতে পছন্দ করে। বাংলাদেশের হাওড়, বাওড়, খাল বিল পঁচা পুকুর ধানক্ষেত এবং বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে এদের পাওয়া যায়। কুচিয়া মাটিতে গর্ত করে বা জলজ আবর্জনা নীচে থাকতে পছন্দ করে। কুচিয়া রাক্ষুসে স্বভাবের ও নিশাচর প্রাণি। প্রকৃতিতে কুচিয়া ছোট ছোট পোকামাকড়, জীবন্ত ছোট মাছ, কেঁচো, শামুক ঝিনুকসহ অমেরুদন্ডী প্রাণি খেয়ে জীবন ধারণ করে থাকে।

বাংলাদেশের উপজাতি জনগোষ্ঠীর মাঝে এই মাছ ব্যাপক জনপ্রিয়। উপজাতি সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে এই মাছ খেলে শারিরিক দূর্বলতা, রক্তশূন্যতা, এজমা, রক্তক্ষণ এবং ডায়বেটিকস ইত্যাদি রোগমসূহ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। এই মাছের বায়ুথলি তাজা বা শুকনা অবস্থায় খেলে এজমা এবং বাত জ্বর আর বাড়ে না। কুচিয়া মাছের স্যুপ বা মাংসের বিভিন্ন ধরণের হার্বস মিশিয়ে কারি রান্না করে এনিমিয়া পাইলস ইত্যাদি রোগ সেরে যায়। বিভিন্ন গবেষণায় প্রকাশিত প্রতিবেদনও তাঁদের এই বিশ্বমানের সাথে একমত পোষণ করে। এছাড়া পুষ্টিমান বিবেচনায় অন্যান্য মাছের তুলনায় কুচিয়া মাছে পুষ্টির পরিমাণ বেশি। ভক্ষণযোগ্য প্রতি ১০০ কুচিয়া মাছে প্রায় ১৮.৭ গ্রাম প্রোটিন, ০.৮ গ্রাম চর্বি, ২.৪ গ্রাম কার্বহাইড্রেট, ১৪০০ মাইক্রো গ্রাম ভিটামিন, ১৮৫ গ্রাম ক্যালসিয়াম রয়েছে। এছাড়া ১০০ গ্রাম কুচিয়া মাছ ৩০০ কিলোক্যালরির বেশি খাদ্য শক্তির যোগান দিতে পারে। সর্পাকৃতি বা অন্যান্য কারণে কুচিয়া মাছ বাংলাদেশের সর্বসাধারণের কাছে জনপ্রিয় না হলেও আন্তর্জাতিক বাজারে এর ব্যাপক চাহিদার কারণে এই মাছের বাণিজ্যিক মূল্য অনেক।

কুচিয়া মাছের প্রজনন বৈশিষ্ট্য

প্রজনন মৌসুমে সাধারণত স্ত্রী কুচিয়া মাছের গায়ের রং গাঢ় হলুদ এবং পুরুষ কুচিয়া মাছ কালো বর্ণের হয়ে থাকে। যেহেতু কুচিয়া মাছ লিঙ্গ পরিবর্তন করতে সক্ষম তাই শুধুমাত্র বাহ্যিক বর্ণের উপর ভিত্তি করে পুরুষ এবং স্ত্রী কুচিয়া মাছকে আলাদা করা সম্ভব নয়। তবে প্রজনন মৌসুমে স্ত্রী কুচিয়া মাছের যৌনাঙ্গ এবং পেট কিছুটা স্ফীত হয়। পুরুষ কুচিয়া মাছ স্ত্রী কুচিয়া মাছের তুলনায় আকারে ছোট হয়ে থাকে। কুচিয়া মাছ বছরে একবার মাত্র প্রজনন করে থাকে। প্রকৃতিতে ২০০-৪০০ গ্রাম ওজনের কুচিয়া মাছ পরিপক্ক হয়ে থাকে এবং গড়ে ২৫০-৬৫০ টি ডিম ধারণ করে। ডিম পাড়ার জন্য জিগ জাগ গর্ত করে থাকে। এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে জুন পর্যন্ত কুচিয়া মাছ প্রজনন কার্য সম্পাদন করে থাকে। নিজেদের তৈরী গর্তে ডিম দেয় এবং সেখানেই ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। এই সময় কুচিয়া খুব কাছে থেকে ডিম পাহাড়া দেয় এবং বাবা কুচিয়া আশপাশেই অবস্থান করে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হওয়া থেকে শুরু করে ডিম্বথলি নি:শোষিত না হওয়া পর্যন্ত বাচ্চাগুলোকে মা কুচিয় শত্রুর আক্রমন থেকে রক্ষা করে।

কুচিয়া মাছের নিয়ন্ত্রিত প্রজনন কৌশল
ব্রুড প্রতিপালন পুকুর নির্বাচন ও প্রস্তুতকরণ

চিত্র : ব্রুড কুচিয়া মাছ সংগ্রহ এবং পরিচর্যা

পুকুরের আয়তন ৩-১০ শতাংশ হলে ভাল। যেহেতু কুচিয়া মাটির অনেক নীচ পর্যন্ত গর্ত করে এক পুকুর থেকে অন্য পুকুরে চলে যায় সেহেতু নির্ধারিত পুকুরে কুচিয়াকে রাখার জন্য পুকুরের তলদেশ এবং পাড় পাকা করা সম্ভব হলে ভাল নতুবা গ্লাস নাইলনের নেট বা রেক্সিন বা মোটা পলিথিন দিয়ে পুকুরের তলদেশ এবং পাড় ঢেকে দিতে হবে। গ্লাস নাইলনের নেট বা রেক্সিন বা মোটা পলিথিনের উপর কমপক্ষে ২-৩ ফিট মাটি দিতে হবে। পুকুরের একপাশে কম্পোস্টের স্তুপ অথবা সারা পুকুরে ১ ইঞ্চি পরিমাণ কম্পোস্ট দিতে হবে। পুকুরের পরিমাণে কচুরীপানা থাকতে হবে। বিশেষ করে প্রজনন মৌসুমে কচুরীপানা পুকুরে ৩/৪ ভাগের বেশি পরিমাণে থাকতে হবে। যেহেতু কুচিয়া কম গভীরতা সম্পন্ন পুকুর বা বিলে পাওয়া যায় তাই তাদের উপযোগী পরিবেশ তৈরীর লক্ষ্যে প্রজনন কালে পানির গভীরতা সর্বোচ্চ ১ ফুট পর্যন্ত রাখা উত্তম। ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ মাসের মধ্যে ২৫০-৩৫০ গ্রাম ওজনের ব্রুড কুচিয়া মাছ সংগ্রহ করতে হবে। সংগৃহীত ব্রুড কুচিয়াকে নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো জন্য হ্যাচারিতে বা পুকুরে স্থাপিত হাপায় রেখে ৫-৭ দিন পরিচর্যা করতে হবে। আহরণ পদ্ধতির জটিলতার কারণে সংগৃহীত অধিকাংশ কুচিয়া মুখে আঘাত থাকে।

চিত্র : রেনামাইসিন

এছাড়া সংগ্রহকারীরা কুচিয়া দীর্ঘদিন অধিক ঘনত্বে চৌবাচ্চায় বা ড্রামে মজুদ রাখে বিধায় পেটের নিচের দিকে ঝোপ ঝোপ রক্ত জমাট বাঁধা অবস্থায় থাকে। আঘাতপ্রাপ্ত বা শরীরে রক্ত জমাট থাকা ব্রুড কুচিয়াকে আলাদা করে আঘাতের পরিমাণ বিবেচনা করে ০.২-০.৫ মিলি এন্টিবায়োটিক রেনামাইসিন প্রয়োগ করতে হবে। স্বাস্থ্যগত দিক বিবেচনা করে প্রয়োজনে একই হারে ২য় বার এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করতে হবে।

ব্রুড কুচিয়া মজুদ

সুস্থ সবল ব্রুড কুচিয়ার পুরুষ এবং স্ত্রী সনাক্ত করার পর ১৫০-২৫০ গ্রাম ওজনের পুরুষ কুচিয়া এবং ২৫০-২৩০ গ্রাম ওজনের স্ত্রী কুচিয়া মাছকে প্রস্তুতকৃত পুকুরে ১:২ অনুপাতে শতাংশে ৩০টি করে মজুদ করতে হবে।

খাদ্য প্রয়োগ

খাদ্য হিসেবে জীবিত মাছ ও শামুক সরবরাহের পাশাপাশি সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। ১০০ গ্রাম সম্পূরক খাদ্যে মাছের মন্ড (৫০%), চেওয়া শুটকী থেকে প্রস্তুতকৃত ফিসমিল (৪০%), কুঁড়া (৫%) এবং আটা (৫%) দিতে হবে। কুচিয়া নিশাচর প্রাণি বিধায় প্রতিদিন সন্ধ্যার পর নির্ধারিত ট্রেতে খাদ্য প্রয়োগ করা উত্তম।

বেবি কুচিয়া সংগ্রহ

প্রজননের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী হলে মে-জুন মাসের মধ্যে ব্রুড প্রতিপালন পুকুর থেকে পোনা সংগ্রহ করা সম্ভব। মূলত: ডিম্বথলি নি:শোষিত হওয়ার পর পোনাগুলো বাবা-মায়ের আশ্রয় ছেড়ে কচুরীপানার শেখরে উঠে আসে এবং সেখানে খাদ্যের সন্ধান করে। মে মাসের ১ম সপ্তাহে কিছু পরিমাণে কচুরীপানা উঠিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। পোনা প্রাপ্তি নিশ্চিত হলে প্রাথমিকভাবে গ্লাস নাইলনের তৈরী হাপার মাধ্যমে কচুরীপানা সংগ্রহ করে পুকুর পাড়ে বা সমতল স্থানে উঠিয়ে আনতে হবে। ১৫-২০ মিনিটের জন্য হাপার মুখ হালকাভাবে বেঁধে রাখতে হবে। অত:পর হাপার বাঁধন খুলে আলতোভাবে উপর থেকে কচুরীপানা ঝেড়ে সরিয়ে ফেলতে হবে। ইতোমধ্যে জমা হওয়া পোনা গুলোকে সংগ্রহ করে প্রাথমিকভাবে হ্যাচারীতে বা পুকুরে পূর্ব থেকে স্থাপিত ফিল্টার নেটের হাপায় মজুদ করতে হবে। যেহেতু সকল মাছ একই পরিপক্ক হয় না তাই মে মাসে কচুরীপানা থেকে পোনা সংগ্রহের পর পর্যন্ত পরিমাণে কচুরীপানা পুনরায় দিতে হবে। ১৫ দিন অন্তর অন্তর কচুরীপানা পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং একই পদ্ধতিতে পোনা সংগ্রহ করতে হবে।

পোনা লালন পাল ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা

কুচিয়ার পোনা স্টীলের ট্রে বা সিস্টেমের চৌবাচ্চায় বা পুকুরে ফিল্টার নেটের হাপায় লালন পালন করা যায়। ট্রে বা চৌবাচ্চা বা হাপায় আয়তকার বা বর্গাকার হতে পারে। সাধারণত মাছের ক্ষেত্রে ৩টি অর্থাৎ রেণু পোনা ধানী পোনা এবং আঙ্গুলি পোনা পর্যায়ে পৃথক পৃথক ভাবে পরিচর্যা করা হয়ে থাকে। কুচিয়ার পোনা ও ৩টি ধাপে প্রতিপালন করতে হয়। ট্রে বা চৌবাচ্চায় বা হাপায় কুচিয়ার পোনা লালন পালনের ক্ষেত্রে ওজনের উপর ভিত্তি করে ধাপে ধাপে খাদ্য পরিবর্তন করতে হবে। পোনা মজুদের পর পরই ঝোপালো শেখর যুক্ত

কচুরীপানা কিছু পরিমাণে সরবরাহ করতে হবে। যেহেতু এটি ১ম ও ২য় ধাপের পোনার আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে সেহেতু কচুরীপানা সংগ্রহ করে সহজেই পোনা নমুনায়ন করা সম্ভব। কুচিয়া মাছ স্বপ্রজাতিভোগি প্রাণি বিধায় প্রতিটি ধাপে স্বাস্থ্য পরীক্ষাকালীন সময়ে অপেক্ষকৃত ছোট এবং দুর্বল পোনা গুলোকে আলাদা করতে হবে।

১ম ধাপে অর্থাৎ বেবি কুচিয়া/গ্লাস ইল প্রতিপালন

ডিম্বথলি নি:শোষিত হওয়া পোনাকে বেবি কুচিয়া বা গ্লাস ইল বলা হয়। বেবি কুচিয়ার গায়ের রং গাঢ় বাদামী বা কালো বর্ণের হয়। এই পর্যায়ের পোনা প্রতিপালন ক্ষেত্রে প্রতিবর্গ মিটারে ৪০০-৫০০টি কুচিয়ার পোনা মজুদ করা যায়। বেবি কুচিয়া মজুদের পর পর্যাপ্ত পরিমাণে জুপাংটন সরবরাহ করতে হবে এবং বেবি কুচিয়া মজুদের ২-৩ দিন পর সম্ভব হলে রাঁজপুঁটি অথবা যে কোন মাছের সদ্য প্রস্ফুটিত রেণু সরবরাহ করলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। তবে জুপ্লাংটন সরবরাহ অব্যাহত রাখতে হবে। ৩-৪ দিন অন্তর অন্তর পোনার স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করে অপেক্ষাকৃত ছোট পোনা গুলোকে আলাদা করতে হবে।

২য় পর্যায়ে কুচিয়ার পোনা প্রতিপালন

চিত্র: টিউবিফেক্স

সাধারণত: ১০-১৫টি পোনার ওজন ১ গ্রাম হলে এই পর্যায়ের অর্ন্তভুক্ত হয়। এই ক্ষেত্রে প্রতি বর্গ মিটারে ১৫০-২০০ টি কুচিয়ার পোনা মজুদ করা যায়। এই পর্যায়ে জীবিত টিউবিফেক্স সরবরাহ করতে হবে। এজন্য ট্রে বা চৌবাচ্চায় টিউবিফেক্স বেড তৈরি করতে হবে। তবে হাপায় পোনা লালন পালনের ক্ষেত্রে টিউবিফেক্স কুচি কুচি করে কেটে সরবরাহ করতে হবে। এই সময় ৫-৭ দিন পরপর পোনার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে অপেক্ষাকৃত ছোট পোনা গুলোকে আলাদা করতে হবে।

৩য় পর্যায়ে কুচিয়ার পোনা প্রতিপালন

সাধারণত: ৪-৫ গ্রাম ওজনের পোনা এই পর্যায়ের অর্ন্তভূক্ত হয়। এই ক্ষেত্রে প্রতি বর্গ মিটারে ৭৫-১০০টি কুচিয়ার পোনা মজুদ করা যায়। এই পর্যায়ে খাদ্য হিসেবে জলজপোকা (হাঁস পোকা) জীবিত বা মৃত অবস্থায় সরবরাহ করা যেতে পারে। পাশাপাশি সম্পূরক খাদ্য হিসেবে পোনার দেহ ওজনের ১০-১৫% পর্যন্ত মাছের ভর্তা সন্ধ্যার পর সরবরাহ করলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। তবে এই সময়ে ট্রে বা চৌবাচ্চায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। বাজার উপযোগী কুচিয়া উৎপাদনের জন্য পোনার ওজন ১৫-২০ গ্রাম হলে ব্রুড প্রতিপালনের ন্যায় পোনা একই পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত পুকুরে মজুদ করতে হবে। তবে পোনার ওজন ৪০-৫০ গ্রাম হলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।

মজুদপূর্ব মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ উপযোগী পোনা প্রাপ্তি সম্ভব না হলে প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে সনাতন পদ্ধতিতে কুচিয়া সংগ্রহ করা হলে আঘাতজনিত কারণে মাছের শরীরে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে। সময়মতো উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে এ ক্ষত মাছের মৃত্যুর কারণও হতে পারে। কুচিয়া সংগ্রহের পরপরই পাঁচ পিপিএম পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দিয়ে ১ ঘন্টা গোসল করিয়ে মাছগুলোকে পর্যবেক্ষণ হাপা/সিস্টার্ন কমপক্ষে ৪৮ ঘন্টা রেখে দিতে হবে। পরে সুস্থ, সবল মাছগুলোকে কেবলমাত্র মজুদ করতে হবে।

পোনা মজুদ

মধ্য ফেব্রুয়ারি থেকে মধ্য মার্চ অর্থাৎ ফাল্গুন মাসে উৎপাদিত পোনা/প্রকৃতি থেকে ৪০-৫০ গ্রাম ওজনের কুচিয়া মাছের পোনা সংগ্রহ করে মজুদপূর্ব যথাযথ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পর প্রতি শতাংশে ৪০০টি হারে সুস্থ সবল পোনা সিস্টার্ন নেট পরিবেষ্টিত পুকুরে মজুদ করতে হবে। তবে মজুদের পূর্বে সিস্টার্ন/নেট বেষ্টিত পুকুরে হেলাঞ্চা দিতে হবে।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

রাক্ষুসে স্বভাবের হলেও কুচিয়ার সম্পূরক খাদ্য গ্রহণ করে। চাষকালীন পুরো সময়জুড়ে কুচিয়া মাছকে প্রতিদিন দেহ ওজনের ৩-৫% খাবার প্রয়োগ করতে হবে। মাছের আকার এবং জলবায়ুর ওপর বিশেষত তাপমাত্রার তারতম্যের ওপর ভিত্তি করে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা উচিত। গবেষণায় দেখা যায়, কুচিয়া ২০ থেকে ৩৫ ডিগ্রি সে, পর্যন্ত তাপামাত্রায় খাবার গ্রহণ করে। তবে ২৫ থেকে ৩০ডিগ্রি সে. তাপামাত্রায় বেশি স্বাচ্ছন্দবোধ করে। কুচিয়ার সম্পূরক খাদ্য হিসেবে মাছের ভর্তা অটো রাইসমিলের কুঁড়া ফিশমিল চেওয়া মাছ এবং আটা মিশিয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে। খাবার অপচয় রোধে ফিডিং ট্রেতে খাবার সরবরাহ করা উত্তম। সম্পূরক খাদ্য ছাড়াও মাছের জীবিত পোনা সরবরাহ করলে ভালো উৎপাদন আশা করা যায়। নিম্ন ছকে কুচিয়ার ১০০ গ্রাম সম্পূরক খাদ্য তৈরির জন্য বিভিন্ন উপকরণের তালিকা দেয়া হলো

সারণি ১: কুচিয়ার ১০০ গ্রাম সম্পূরক খাদ্যে বিভিন্ন উপকরণের পরিমাণ

খাদ্যের উপকরণ	পরিমাণ (গ্রাম)	আনুমানিক মূল্য
মাছের ভর্তা	৫০০.০০	৩০.০০
ফিশমিল	৪০০.০০	৩২.০০
কুঁড়া	৫০.০০	১.০০
আটা	৫০.০০	১.৫০
মোট=	১০০০.০০	৬৪.৫০

আহরণ ও উৎপাদন

মাছের ওজন এবং বাজারে চাহিদার ওপর নির্ভর করে কুচিয়ার আহরণ করতে হবে। সঠিক ব্যবস্থাপনায় ৬-৭ মাস চাষ করলে কুচিয়া গড়ে ২০০-২৫০ গ্রাম হয়ে থাকে। গবেষণায় দেখা যায়, সিস্টার্ন/নেট পরিবেষ্টিত পুকুরে এ মাছের বেঁচে থাকার হার ৯০ থেকে ৯৭%। চাষ ব্যবস্থাপনা সঠিক থাকলে শতাংশে ৭০-৭৫ কেজি কুচিয়া উৎপাদিত হয়। নিম্ন ছকে শতাংশ প্রতি কুচিয়া চাষের আয়-ব্যয়ের বিশ্লেষণ দেয়া হলোঃ

সারণি ২: প্রতি শতাংশ পুকুরে কুচিয়া চাষের আয়-ব্যয়ের বিশ্লেষণ

আয়-ব্যয়ের খাত	পরিমাণ (টাকা)
নেট তৈরি বাবদ ব্যয়	১,০০০.০০
পোনার মূল্য (৪০০টি, প্রতিটি ৫/-)	২,০০০.০০
খাদ্য খরচ (১৪৪ কেজি, প্রতি কেজি ৬৪.৫০ টাকা)	৯,২৮৮.০০
বিবিধ খরচ	১,০০০.০০
মোট ব্যয়=	১৩,২৮৮.০০
মাছের বিক্রয় মূল্য (৭২.০ কেজি, ৩২৫/প্রতি কেজি)	২৩,৪০০.০০
প্রকৃত আয়=	১০,১১২.০০
আয়-ব্যয়ের অনুপাত=	১:০.৭৬
এফসিআর	২.০

কুচিয়ার রোগবালাই ব্যবস্থাপনা

যেহেতু কুচিয়া মাটিতে গর্ত করে এবং ময়লা আর্বজনার মধ্যে বসবাস করে এবং চামড়ার আঁশ অদৃশ্য থাকে তাই কুচিয়া সহজেই রোগ এবং পরজীবি দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। এ জন্য কুচিয়ার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। সাধারণত কুচিয়া মাছ নিম্নলিখিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

১) ক্ষত রোগ বা আলসার ডিজিজ

অন্যান্য মাছের মতো ক্ষত রোগ বা আলসার ডিজিজ কুচিয়ার অন্যতম প্রধান রোগ হিসেবে বিবেচিত। এ রোগের আক্রমনে কুচিয়ার শরীরে নিম্ন লিখিত লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়

- প্রাথমিক পর্যায়ে মাছের গায়ে ছোট ছোট লাল দাগ দেখা দেয়।
- ক্রমান্বয়ে লাল দাগের স্থলে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়।
- লেজের অগ্রভাগে এ রোগের আক্রমণ হলে লেজ খসে পড়ে।
- মাছ খাদ্য গ্রহণ করে না এবং পর্যায়ক্রমে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়।
- আক্রান্ত মাছকে পানি থেকে উঠে আগাছার ওপর অলসভাবে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

প্রতিকার বা নিয়ন্ত্রণ

- মাছ মজুদের আগে প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করে পুকুর জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

- আক্রান্ত মাছকে ০.১-০.২ মি.গ্রাম/কেজি হারে রেনামাইসিন অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশান প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে সপ্তাহ অন্তর ২য় ডোজ প্রয়োগ করতে হবে।

পরজীবীজনিত রোগ

আণুবিক্ষণিক বিভিন্ন প্রকার ক্ষুদ্রজীব থেকে শুরু করে জোঁক পর্যন্ত কুচিয়ার শরীরে বাস করতে পারে। কুচিয়ার শরীরে পরজীবী আক্রমণের ফলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো দেখা যায়

- মাছ অস্বাভাবিকভাবে চলাচল বা লাফালাফি করতে থাকে।
- মাছ খাবার গ্রহণ করা বন্ধ করে দেয় ফলে ক্রমান্বয়ে মাছ দূর্বল হয়ে পড়ে।
- কোন কোন পরজীবীর আক্রমণে মাছের চামড়ায় ছোট ছোট সাদা দাগ দেখা যায়।

প্রতিকার বা নিয়ন্ত্রণ

- আক্রন্ত মাছকে ৫০ পিপিএম ফরমালিন বা ২০০ পিপিএম লবণ পানিতে ১মিনিট ধরে গোসল করাতে হবে।
- আক্রান্ত পুকুরের হাপা ৫০ পিপিএম ফরমালিন বা ২০০ পিপিএম লবণ পানিতে ধুয়ে কড়া রোদে ১-২ দিন ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে।
- পুকুরের পানি সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করে তলদেশে প্রতি শতাংশে ৫০০ গ্রাম হারে লবণ বা ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে।

পুষ্টিহীনতাজনিত রোগ

শুধু জীবাণু বা পরজীবীর কারণেই মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাবও মাছের পর্যাপ্ত বৃদ্ধির অন্তবায়। পুষ্টিহীনতাজনিত রোগের লক্ষণগুলো নিম্নরূপ হয়ে থাকে

- মাছের বৃদ্ধি হার কমে যায়।
- শরীরের তুলনায় মাছের মাথা বড় হয়ে যায়।
- অস্বাভাবিক হারে মাছের ওজন কমতে থাকে এবং মাছ চলাচলের শক্তি হারিয়ে ফেলে।
- ধীরে ধীরে মাছ মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়।

প্রতিকার বা নিয়ন্ত্রণ

- পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করতে হবে।

ভাইরাসজনিত রোগ

কুচিয়া মাছ ভাইরাসজনিত রোগেও আক্রান্ত হতে পারে। তবে Iridovirus প্রকৃতির ভাইরাস দ্বারা সাধারণত বেশি আক্রান্ত হয়। এ ভাইরাস শ্বাসযন্ত্রে আক্রমণ করে বিধায় প্রাথমিক পর্যায়ে রোগের লক্ষণ বাহ্যিকভাবে তেমন প্রকাশ পায় না। তারপরও নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো দ্বারা এ রোগের শনাক্ত করা সম্ভব

- আক্রান্ত মাছ দুর্বল ও ফ্যাকেশে বর্ণ ধারণ করে ঐজ্জ্বল্য হারায়।
- আক্রান্ত দুর্বল মাছে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।
- আক্রান্ত হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যে ব্যাপক মড়ক দেখা দেয়।

প্রতিকার বা নিয়ন্ত্রন

ভাইরাসজনিত রোগের সুনির্দিষ্ট কোনো প্রতিকার না থাকলেও পুকুরে সঠিক পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ রোগের আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

পোনা প্রতিপালনের সতকর্তা

- ট্রে বা চৌবাচ্চায় বা হাপায় পোনা প্রতিপালনের ক্ষেত্রে কচুরীপানা অল্প পরিমাণে দিতে হবে
- কচুরীপানার পরিমাণ বেশি হলে নাইট্রোজেনের আধিক্যের কারণে পোনার মৃত্যুরহার বেড়ে যেতে পারে
- কচুরীপানা তুলে সহজেই পোনার নমুণায়ন করা যায়
- পুকুরে জোঁকের আক্রমণ যাতে না হয় সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে
- জোঁকের আক্রমণ হলে প্রার্দুভাবের উপর ভিত্তি করে পুকুরে পানি কমিয়ে শতাংশে ২৫০-৩৫০ গ্রাম লবণ প্রয়োগ করে ৭-৮ ঘন্টা পর পানি সরবরাহ করতে হবে

- টিউবিফেক্স বেড তৈরী করে পোনা প্রতিপালন করলে সম আকারের পোনা পাওয়া যায় এবং এতে পোনার বেঁচে থাকার হারও অনেক বেশি তবে কোনভাবেই টিউবিফেক্সের বেডে জীবিত হাঁসপোকা সরবরাহ করা যাবে না।

কুচিয়া চাষে সতর্কতা

- হেলেঞ্চা প্রয়োগের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন হেলেঞ্চার সঙ্গে কোনো প্রকার ক্ষতিকর পরজীবী চলে না আসে।
- হেলেঞ্চার পরিমাণ বেশি হলে মাঝে কা কমিয়ে দিতে হবে। নতুবা নাইট্রোজেন আধিক্যের কারণে মাছের গায়ে ফোসকা পড়ে যা পরবর্তীতে ঘা এ পরিণত হতে পারে।
- পর্যাপ্ত খাবারের অভাবে ও রাক্ষুসে স্বভাবের কারনে এক মাছ অন্য মাছকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। আঘাতপ্রাপ্ত, ক্ষতিগ্রস্ত এবং পুষ্টিহীন মাছের বাজারমূল্য অনেক কম।